সমকাল

তারিখ 13 SEP 2017 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিদ্যাবাণিজ্যে রাজনৈতিক-অর্থনীতির ভূমিকা

সমাজ

আমিরুল আলম খান

সাবেক চেয়ারম্যান, যশোর শিক্ষা বোর্ড

> বিদ্যাবাণিজ্যের এই রাজনৈতিক-অর্থনীতি আরও প্রকাশ্য, আরও ভয়ঙ্কর রূপ নেয় নোট-গাইড রচনা, প্রকাশ, অবাধ বাজারজাতকরণ, শিক্ষার্থীদের তা কিনতে বাধ্য করা, দেশব্যাপী কোচিং সেন্টার গড়ে তুলে বিদ্যালয় শিক্ষাকে অকার্যকর করে ফেলা এবং সব দায় শিক্ষকের ঘাড়ে চাপিয়ে প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল ও রক্ষা করার মাধ্যমে। এ কাজে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান দুর্নীতি দমন কমিশনের ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ

বাংলাদেশে শিক্ষা ক্রমশ বহুমূল্যবান পণ্য হয়ে উঠছে। অথচ সংবিধান অনুযায়ী শিক্ষা একটি সেবা খাত। যে জাতি যত বেশি শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ করে, সে জাতি তত বেশি ডিভিডেন্ড পায় এবং তত দ্রুত উন্নতি করে। মানবজাতির ইতিহাস শিক্ষার উন্নয়নের ইতিহাস। শিক্ষাই সভ্যতা নির্মাণকারী। একমাত্র বর্বর ছাড়া শিক্ষা ধ্বংসে কোনো জাতি লিপ্ত হয় না। পৃথিবীতে সভ্যতা যতবার সংকটাপন্ন হয়েছে বা ধ্বংস হয়েছে, তা হয়েছে বর্বরদের আক্রমণেই।

বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। সবচেয়ে বড় অভিযোগ, সংঘবদ্ধ দুর্নীতিবাজদের কাছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিলামে চড়িয়ে তাকে ধ্বংস করা। এখানে বিদ্যাবাণিজ্যের বিশাল এক সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। সে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ছত্রছায়ায় দেশি-বিদেশি সিন্ডিকেট। এই সিন্ডিকেটের বড় তরফ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ তথাকথিত নানা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীরা। তারা একটি ক্লায়েন্ট রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে মনে করে। একে একে নানা রকম শৃঙ্খলে তারা গরিব ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বেঁধে ফেলে। নানা রঙের প্রকল্পের ছদ্মাবরণে শিক্ষা উন্নয়নের নামে ঋণ বা অনুদানের নামে অবাধ লুটপাটের সুযোগ সৃষ্টি করে তারা দুর্নীতির বিস্তার ঘটায়। এভাবে তারা শাসকগোষ্ঠীকে বশ করে। সাম্রাজ্যবাদীদের ভাষায়, এ হলো দেশে দেশে অর্থনৈতিক অন্তর্ঘাত। এ জন্য তারা পেশাদার অর্থনৈতিক ঘাতক গড়ে তোলে ও নিয়োগ করে (আগ্রহী পাঠক পাঠ করতে পারেন, জন পার্কিন্স, এক অর্থনৈতিক ঘাতকের স্বীকারোক্তি)।

ঔপনিবেশিক বাংলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ গড়ে তুলেছিল 'টপ হেভি' শিক্ষা ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে ফেলে প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। কিন্তু সে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী কোথা থেকে পাওয়া যাবে, তা নিয়ে শাসকশ্রেণির মাথাব্যথা ছিল না। প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে না তুলেই ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী একটি তাঁবেদার ও তথাকথিত 'ভদ্রলোক' কেরানি শ্রেণি গড়ে তুলতে তৎপর হয়। তাই ভারতবর্ষে পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থা গড়েই ওঠে উপাধিধারীর সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্য সাধনে। সে ধারা ব্রিটিশ-উত্তর পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশে একই জোশে ধাবমান। সরকারের নেক নজর উচ্চতর শিক্ষার দিকেই। দেশ ভরে গেছে সরকারি-বেসরকারি চটকদার নামের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে। সরকারগুলোই একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। সারা দুনিয়ায় উচ্চশিক্ষা সীমিত; কিন্তু এ অভাগা দেশে সেটাই সবচেয়ে সহজলভ্য। উচ্চশিক্ষা শুধু গবেষণা, নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও জ্ঞান বিস্তরণের জন্য নির্দিষ্ট করা এবং শুধু মেধাবী ও পরিশ্রমী শিক্ষার্থীদের জন্য সীমিত করে দেওয়া উচিত। তা না করে এখন দেশে ৪০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার প্রায় তিন গুণ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। সেখানে সার্টিফিকেট লাভেচ্ছুদের ভিড় আছে কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক নেই! অনেকটির বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট ফেরির অভিযোগ খোদ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের উক্তি এখনও প্রাসঙ্গিক– 'বেঙ্গলের সবচাইতে মিসফরচুন ব্যাপার অইল, এইখানে সাপোর্টিং কলেজ অওনের আগে য়্যুনিভার্সিটি তৈয়ার অইছে। আর মিডল স্কুল তৈয়ার না কইরা কলেজ বানাইছে। শুরু থেইকাই বেঙ্গলের এডুকেশন সিসটেমটা আছিল টপ হেভি। হের লাইগ্যা এইখানে ডিগ্রির লাইগ্যা মানুষের একটি ক্রেজ জন্মাইছে। ... গ্রামে গঞ্জে যেখানেই যাইবেন, দেখবেন, কলেজ জন্মাইতেছে। অখন আমাগো দরকার শক্তিশালী মিডল স্কুল (উদ্ধৃত, আহমদ ছফা, যদ্যপি আমার গুরু, পৃ. ৭৬)।

যে শক্তিশালী 'মিডল' [মাধ্যমিক] স্কুলের কথা জ্ঞানতাপস আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, শিক্ষার সেই শক্তিশালী ভিত আজও বাংলাদেশে গড়ে তোলা হয়নি। ২০১২ সাল পর্যন্ত ব্যানবেইস থেকে যে পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যায়, দেশে মোট বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল ১৮ হাজার ৮৯০টি। এর সবই গড়ে উঠেছে স্থানীয় মানুষের উদ্যোগে। সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে অনেক পরে এবং সরকারি ব্যবস্থাধীনে আনা হচ্ছে সেসব মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যেগুলো গুণেমানে সেরা ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী। অর্থাৎ সরকারি নীতি হলো 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া'। তাতে শিক্ষকদের চাকরি ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হলেও শিক্ষার মানোন্নতি হচ্ছে– কোনো সমীক্ষা থেকেই তার প্রমাণ মেলেনি।

দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যেখানে প্রায় (নাকি) ৬৫ হাজার! এর মধ্যে প্রধান শিক্ষকই নেই ২১ হাজার স্কুলে। আর বছরের শেষ নাগাদ সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য হবে আরও প্রায় ৩২ হাজার। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনের বরাতে এ রিপোর্ট জানা গেছে (দৈনিক শিক্ষা, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭)। এর মধ্যে ২০১৩-২০১৬ সালের মধ্যে প্রায় ২৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি করা হয়। 'নাকি' বলতে হচ্ছে এ কারণে, বাংলাদেশে নির্ভরযোগ্য কোনো পরিসংখ্যানই পাওয়া যায় না। একই সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী পরিসংখ্যান ব্যুরোর বরাতে বলেছেন, দেশে সাক্ষরতার হার ৭২ দশমিক ৩ শতাংশ। অর্থাৎ ২৭ দশমিক ৭ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। তবে এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন গণসাক্ষরতা অভিযানের চেয়ারম্যান ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী। তিনি জাতিসংঘের সাক্ষরতার সংজ্ঞা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের জরিপ অনুযায়ী দাবি করেন, দেশে সাক্ষরতার হার নাকি ৫৪ শতাংশ। (বিডিটুডে.নেট : সাক্ষরতার হার নিয়ে সরকার-বিশেষজ্ঞদের মতপার্থক্য, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭)।

যেখানে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৪২, সেখানে সরকারি কলেজের সংখ্যা ৫৩৭! এর মধ্যে ২০১৭ সালে ৩২৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ২৮৫টি কলেজ সরকারি করা হয়েছে বা প্রক্রিয়াধীন। বর্তমানে দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪০।

আবার সরকারি-বেসরকারি স্কুল-কলেজের সংখ্যার হিসাব কি মানানসই? গড়ে যদি তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিপরীতে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়, তবে দেশে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হওয়া উচিত অন্তত ২১ হাজার। অর্থাৎ সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষও স্বীকার করতে বাধ্য হবে, দেশে কাঙ্ক্ষিত ৩৩ শতাংশের স্থলে মাত্র ১ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্ব সরকার পুরোপুরি গ্রহণ করেছে। আর বাকি ৯৯ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়ে যাচ্ছে 'হাঁটানো ছেলে'র মতো নিতান্ত অবাঞ্ছিত হয়ে। আবার বিপরীত দিক থেকে বিচার করলে মাত্র ৬৪২ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিপরীতে ৫৩৭ সরকারি কলেজও সংখ্যায় বেমানানভাবে স্ফীত। কোনোক্রমেই তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কিন্তু একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চেয়ে একটি কলেজ সরকারি করায় রাজনৈতিক ফায়দা অনেক বেশি।

সাবেক শিক্ষা সচিব এনআই খান হিসাব কষে বলেছিলেন, সরকার যেহেতু বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতন, অবকাঠামো নির্মাণসহ অন্যান্য সহযোগিতা দিয়ে আসছে, সেহেতু আর মাত্র দেড় হাজার কোটি টাকার বার্ষিক বরাদ্দ দিলে সব মাধ্যমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ সম্ভব। তার হিসাবে দ্বিমত করার কিছু নেই।

কিন্তু অভিজ্ঞজন মনে করেন, সেখানে যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেবে, তা যতটা আর্থিক তার চেয়ে বেশি প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার। সরকার দেশের সরকারি কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় চরম অদক্ষতা দেখিয়ে আসছে। দুর্নীতি সেখানে সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে। অর্থাৎ ১৭ কোটি মানুষের দেশে শিক্ষার মতো বিশাল প্রশাসন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সামর্থ্য ও দক্ষতা কোনোটাই সরকারের নেই। সে সদিচ্ছাও কোনো রাজনৈতিক দলের নেই।

এই তো হলো পরিসংখ্যানগত অসামঞ্জস্য। এ দেশে গ্রামীণ ও প্রান্তিক শ্রেণির শিশুরাই কেবল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে যায়। প্রধান অভিযোগ, সেখানে লেখাপড়া করানো হয় না। কারণ, শিক্ষক স্বল্পতা তো আছেই; তদুপরি সরকারের নানা কাজে তারাই হলেন 'হরফুল মৌলা'! কিন্তু মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তাদের স্বপ্ন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ। অথচ ভালো মানের মাধ্যমিক বিদ্যালয় না থাকায় অভিভাবকরা সন্তানদের নিয়ে দেশের সীমিত সংখ্যক নামি স্কুলে ভিড় জমান। উচিত ছিল দেশে মানসম্পন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার পাশাপাশি মানসম্পন্ন পিরামিড সোপানিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা। কিন্তু তা হয়নি; হওয়ার কোনো উদ্যোগও নেই। কারণ, প্রধানত রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ।

১৯৯১ সালে গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে বিদ্যা আকস্মিকভাবেই অতি লাভজনক বাণিজ্যে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক আশীর্বাদেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার নামে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগবাণিজ্য এবং অবকাঠামো নির্মাণে ব্যাপক দুর্নীতির প্রসার ঘটেছে এবং সেই থেকে এ দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে নতুন রাজনৈতিক-অর্থনীতি আঙুল ফুলে বটগাছ হয়েছে তার লাগাম টেনে ধরার সাধ্য বোধকরি কারও নেই, সে সদিচ্ছাও নেই। বিগত আড়াই দশকে গোটা বিদ্যাবাণিজ্যের বণিকদের কাছে এ দেশের রাজনীতি হয় দাসখত লিখে দিয়েছে, নয়তো নিজেরাই তার কাণ্ডারি হয়েছে। রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে বিদ্যাবাণিজ্য এতটা লাভজনক হয়ে উঠেছে যে, তাকে অবাধ লুণ্ঠন ছাড়া আর কোনো নামেই অভিহিত করা যাবে না।

বিদ্যাবাণিজ্যের এই রাজনৈতিক-অর্থনীতি আরও প্রকাশ্য, আরও ভয়ঙ্কর রূপ নেয় নোট-গাইড রচনা, প্রকাশ, অবাধ বাজারজাতকরণ, শিক্ষার্থীদের তা কিনতে বাধ্য করা, দেশব্যাপী কোচিং সেন্টার গড়ে তুলে বিদ্যালয় শিক্ষাকে অকার্যকর করে ফেলা এবং সব দায় শিক্ষকের ঘাড়ে চাপিয়ে প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল ও রক্ষা করার মাধ্যমে। এ কাজে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান দুর্নীতি দমন কমিশনের ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ। সারাদেশ ব্র্যান্ডেড কোচিং সেন্টারে ভরে গেলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দুদকের নজর শুধু চুনোপুঁটি স্কুল শিক্ষকদের ওপর, রাঘববোয়ালরা থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাদের সদর দরজার ঢিল ছোড়া দূরত্বে বিশাল বিশাল অট্টালিকায় ততোধিক বড় বড় বিলবোর্ড লাগিয়ে যেসব কোচিং সেন্টার শিক্ষার বারোটা বাজাচ্ছে আর লুটে নিচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা, তারা তাদের দেখতে পান না! দেখতে পান না নোট-গাইড বিক্রি করে রাতারাতি যারা হাজার হাজার কোটি টাকা লুটে নিচ্ছে তাদেরও! বরং এনসিটিবির অসৎ, অদক্ষ কর্মকর্তাদের যোগসাজশে দেশে এখন পাঠ্যবই বলে কিছু নেই; সৃজনশীল তকমা বুকে এঁটে সবই স্রেফ নোট-গাইড। তাদেরও এরা চিনতে পারেন না! স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রীর বরাতে বলা হয়, দেশে নাকি ৩২ হাজার কোটি টাকার শুধু কোচিংবাণিজ্যই হয়! প্রকৃত বিদ্যাবাণিজ্যের আকার নিশ্চয় বহুগুণ বেশিই।

বিদ্যাবাণিজ্যের এই রাজনৈতিক-অর্থনীতি করপোরেট পুঁজিবাদের নিকৃষ্টতম দানবীয় রূপ। এই দানবকে রুখতে না পারলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

amirulkhan7@gmail.com

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..........
তারিখ..........
চিফ. পরিসংখ্যান বিভাগ
চিফ. ই.এল.পি বিভাগ
সিনিয়র এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর